আ. ন. স. হাবীবুর রহমান

শিক্ষানীতিতে যা উপেক্ষিত

কারের উচ্চ পর্যায়ে তীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ হয়েছে। দেশের বরেণ্য শেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও যথেষ্ট পরিশ্রম করে খসড়া চূড়ান্ত করেছেন। মতামত নিয়ে সরকার হিসেবে জাতিকে অচিরেই ল উপহার দেবে। বর্তমান শিক্ষানীতির বয়স্ক ও ক শিক্ষা অধ্যায়ের ওপর াত করা হল।

চর এই অধ্যায়ের শুরুতেই য়েছে 'বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৪ সালের মধ্যে স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর চালা।' বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আগে যে ইশতেহার প্রকাশ হ তাতে এই লক্ষ্যই বর্ণিত আছে। শের রায় পাওয়া এই সরকার রতার ক্ষেত্রে যে বড় উদ্যোগ নেবে স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে দেয়া সময়সীমা নিয়ে। সহস্রাব্দ ্যমাত্রায় আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ লাদেশে বয়স্ক নিরক্ষরতার হার র্ধেকে নামিয়ে আনার কথা বলা য়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় ৫০ তাংশ নিরক্ষরতাকে ২৫ শতাংশে ামিয়ে এনে ২০১৫ সালে ১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা ৭৫ শতাংশে উন্নীত করবে। সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পর বাংলাদেশে সরকারিভাবে বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞমহল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে আরও কয়েক বছর পিছিয়ে দেয়ার পক্ষে মতপ্রকাশ করছেন। ফলে সরকার বয়স্ক শিক্ষার জন্য একটি জোরালো কর্মসূচি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট সময় পাবে। আওয়ামী লীগের ইশতেহারের প্রতিধ্বনি না করে শিক্ষানীতি পর্যালোচনা কমিটি এর বাস্তব দিকটি খতিয়ে দেখলে ভালো হতো। শিক্ষানীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুণীজনরা অবশ্যই জানেন, অতীতে আমাদের দেশে বয়স্ক সাক্ষরতা নিয়ে সরকারিভাব অনেক তেলেসমাতি হয়েছে। এখানে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি সাক্ষরতা অভিযান শুরু করেছিলেন। ওই অভিযানের অংশ হিসেবে 'বড়দের বই' নামে এক কোটি বই ছাপানো হয়েছিল। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী প্রতি দুইজন বয়স্ককে সাক্ষর করাসহ অনেক কার্যক্রমের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। ওই সময় প্রতি মাসে থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা ঢাকায় সাক্ষরতার প্রতিবেদন পাঠাতেন। এসব প্রতিবেদন একত্রিত করে এক বছরে প্রায় ৭৮ লাখ বয়স্ককে সাক্ষর করার যে দাবি করা হয় তার সঙ্গে বাস্তবতার কোন মিল ছিল না। ১৯৮১ সালে যে আদমশুমারি পরিচালিত হয় তাতেও সাক্ষরতা অভিযানের কোন প্রতিফলন ছিল না। মূলত ওই সময় থেকে জনমনে বয়স্ক সাক্ষরতার ওপর একটি নেতিবাচক ধারণা জন্ম নেয়। অন্যদিকে ৮০-এর দশকে বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা অপরাপর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমন্বিতভাবে বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করে দরিদ্র মানুষকে ক্ষমতায়নের স্বপ্ন দেখায়। বয়স্ক সাক্ষরতার ধীর ও কার্যকর এই প্রক্রিয়া সমাজে গুণিতক প্রভাব সৃষ্টি করে। এরকম ধারাকে এগিয়ে নিয়ে সরকার দেশের উন্নয়নে দরিদ্র মানুষকে আরও সম্পৃক্ত করতে পারত।

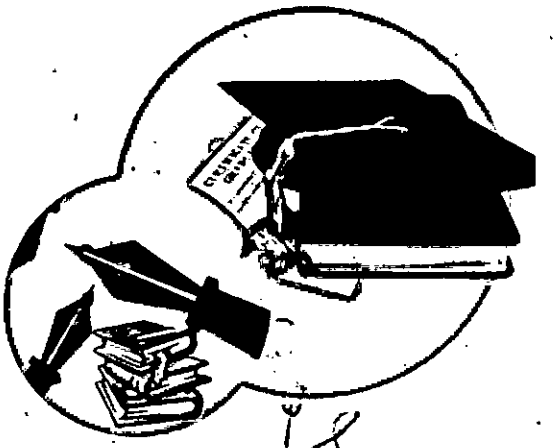

অতীতের কার্যক্রমের মূল্যায়ন না করে ১৯৯৭ সাল থেকে জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে বিভিন্ন জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) শুরু করা হয়। বছর ঘুরতে একেকটি জেলাকে শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ সাক্ষর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ওই আন্দোলনের নামে সাক্ষরতার পরিসংখ্যান স্ফীতিও এ দেশের মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। ২০০১ সালের আদমশুমারির সময় টিএলএম পরিচালিত জেলাগুলোয় সাক্ষরতার কোন উন্নত চিত্র পরিলক্ষিত হয়নি। এমতাবস্থায় সব প্রাপ্তবয়স্ক লোককে সাক্ষর করা এবং এর জন্য ২০১৪ সালকে নির্ধারণ নিয়ে পুনর্বার ভাবতে হবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত এবং প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকে সাক্ষর করা পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হবে। এটি একটি যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য। আসলে বয়স্ক সাক্ষরতার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা থাকা দরকার। তা করলে আমরা এক বা দেড় দশকের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতার দাবিদার হতে পারব। শিক্ষানীতির খসড়ায় ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষরদের অগ্রাধিকার দেয়াকে কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিও বাস্তবতার সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। এই বয়সের জনগোষ্ঠীকে উদ্দীষ্ট করে বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আমরা যদি সাক্ষরতার হার আরও ২৫ শতাংশ বাড়াতে পারি সে অর্জনও আমাদের জন্য কম নয়।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বয়স্ক শিক্ষার সহায়কদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বয়স্ক সাক্ষরতার বৈচিত্র্যের দিকটিও যথাযথভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। পাঠ অনুশীলনচক্র ও গ্রাম শিক্ষা মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষার দিকটিও গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। কার্যকর পদ্ধতি, উপকরণ ও প্রক্রিয়ার ব্যবহারে সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনার জোরালো সুপারিশ করা হয়েছে। কার্যকর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণে মূল্যায়ন কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, বয়স্কদের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা বেশ দুরূহ কাজ। সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচ দিন এবং দিনে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা হিসেবে ২০-২৫ জনের একটি দলের জন্য ছয় থেকে নয় মাস নিবিড়ভাবে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করলেই কেবল অংশগ্রহণকারীদের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশকে সাক্ষর করা যায়। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি এনজিও'র পরীক্ষিত পদ্ধতি রয়েছে। এসব পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করে সফলভাবে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। বেতার ও টেলিভিশনের কার্যক্রম এবং অন্যান্য দূরশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাক্ষরতা সহায়ক ও তত্ত্বাবধায়কদের কার্যকর বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা দেয়া যেতে পারে, কিন্তু তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ হতে হবে কমপক্ষে তিন সপ্তাহের এবং তা হবে অনুশীলনকেন্দ্রিক। কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বয়স্ক সাক্ষরতার খণ্ডকালীন সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। তবে তাদের সবাইকে নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতায় রাখতে হবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত, অথচ যথাযথ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না বা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী এমনসব শিশুর জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। এতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারা শেষে শিশু-কিশোররা যাতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, সে লক্ষ্যে দুই ধারার মধ্যে সমমান স্থাপনের কথাও এতে উল্লিখিত আছে। অন্যদিকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য শিক্ষকদের শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কর্মোদ্যোগের সমন্বয় করতে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে 'বাংলাদেশ অব্যাহত ও দক্ষতা সংস্থা' গঠনের কথা বলা হয়েছে। এটি একটি সময়োপযোগী ও যুগান্তকারী সুপারিশ। তবে এরকম সংস্থাকে 'গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ফাউন্ডেশন' নামে অভিহিত করলে তা বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সামগ্রিকতাকে ধারণ করবে। এই সংস্থার গঠন কাঠামো প্রস্তাবনায় নেই, তবে পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মতো কাঠামো দ্বারা এটি পরিচালিত হতে পারে।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সরকার ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যকার অংশীদারিত্বের বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। অতীতে সরকার বেসরকারি সংস্থাকে ঠিকাদারের মতো বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োগ দিয়েছে। এতে করে এমনসব সংস্থাও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে নিয়োগ পেয়েছে যেগুলোর কোন সক্ষমতা নেই বা যারা মোটেই এরকম কাজে আন্তরিক নয়। এতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত মান অর্জিত হয়নি। আর এরকম ঠিকাদারি ব্যবস্থাটিই মূলত দুর্নীতির সূচনা। সরকারের এই ব্যবস্থার কারণেই অনেক সক্ষম ও ভালো সংস্থা সরকারের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়নি যার ফলে জাতি উন্নত সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রস্তাবিত সমন্বয় সংস্থাকে বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী সংস্থা চিহ্নিত করতে হবে। সক্ষমতা অনুযায়ী এসব সংস্থা যাতে এগিয়ে আসে সেজন্য সরকারকে আহ্বান জানাতে হবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোর উচিত হবে দেশে কার্যকর সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যকে আরও বিস্তৃত ও সংহত করা।

বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন, শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় জনসমাজের অংশগ্রহণসহ উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পাদনে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষানীতি দলিল আকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে এই দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান : *সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ*